স্বরূপে ক্রিকেট কিং

ব্রায়ান চার্লস লারা। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানের অধিকারী হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে শেষ হওয়া টেস্ট সিরিজে হলো নতুন রেকর্ড...

লিখেছেন **নাসিম আহমেদ**

আশির দশকে ক্রিকেটে মূল লড়াই ছিল অলরাউন্ডারদের। হ্যাডলি, ইমরান, কপিল, বোথামরা তাদের ব্যাট-বলের ম্যাজিকে দলকে জিতিয়েছেন। এনেছেন সম্মানজনক ড্র। ক্রিকেট যত গাণিতিক হয়েছে ব্যাটসম্যান বা বোলাদের ওপর দলের নির্ভরতা তত বেড়েছে। এক দিনের ম্যাচের জনপ্রিয়তা এবং ব্যবসায়িক সাফল্য ক্রিকেটকে পরিবর্তন করেছে। ব্যবসায়িক চিন্তাভাবনা থেকে দর্শকদের আনন্দ দেয়ার জন্য পিচ বানানো হচ্ছে ব্যাটিং-সহায়ক। তবে টেস্ট ক্রিকেট এখনো রয়ে গেছে আগের মতো। একজন ব্যাটসম্যানের ধৈর্য, টেকনিক এবং বুদ্ধির চূড়ান্ত পরীক্ষা হয় এখানে। আর সেই পরীক্ষায় বর্তমানে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাচ্ছেন ব্রায়ান লারা। সাবেক অসি দলপতি বোর্ডারের করা ১১১৭৪ রানের রেকর্ড ভেঙে গেছে। অ্যাডিলেডে ম্যাকগ্রার করা দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় ওভারে সিঙ্গেল নিয়ে বোর্ডারের রান টপকে যান লারা।

২০০০ সালে যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়কত্ব ছাড়েন তখন লারা বলেছিলেন, তিনি নব্বই দশকের সেরা ব্যাটসম্যান হতে চান। এটাই তার লক্ষ্য। এ পর্যন্ত লারার যা অর্জন তাতে বলা যায়, লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন ক্যালিপসোদের গর্ব। এ বছর ত্রিনিদাদ ও টোবাকো বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে। এটা নিয়ে সে দেশের অনেকে আনন্দ উল্লাস করেছে। তবে এই আনন্দকে ছাড়িয়ে গেছে লারার অর্জন। তার রেকর্ডে রীতিমতো উৎসব হয়েছে সেখানে। দেশের অর্জনের চেয়ে ব্যক্তি অর্জনকে বড় করে দেখেছে দেশবাসী। লারার মতো বড় তারকা আর আসবে না। তাই বড় তারকাকে দেবতুল্য সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করেনি কেউ।

লারার অবশ্য ক্রিকেটার নয়, ফুটবলার হবার কথা ছিল। বন্ধু ডোয়াইট ইয়র্ক এখনো জাতীয় দলে খেলছেন। খেলেছেন ইংলিশ লীগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পক্ষে। ছেলেবেলায় লারার ক্রিকেট,ফুটবল দুটোতেই উৎসাহ ছিল। ক্রিকেট পাগল পরিবারে জন্ম তার। সেই সূত্রে ক্রিকেট তার রক্তে। কিন্তু গতি ও বুদ্ধির দৌড়ে ফুটবলের অনূর্ধ্ব-১৪ দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন। ত্রিনিদাদ ও টোবাকো দলের খেলা ছিল 'লং বল' স্টাইলে। উচ্চতা খুব বেশি না হওয়ায় ক্রমে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন তিনি। নিজের আগ্রহের পুরোটা দিয়ে দেন ক্রিকেটকে।

ছেলেবেলায় ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং ছিল লারার ধ্যান-জ্ঞান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ গ্রেট সোবার্স, কানহাই, ওরেল, ইউকসের ব্যাটিং তাকে রোমাঞ্চিত করতো। সান্তা ক্রুজের ক্যান্টারো গ্রামে সতীর্থদের নিয়ে তিনি মেতে উঠতেন খেলায়। অন্যরা যখন পরিশ্রান্ত হয়ে মাঠ ছেড়ে যেত, তখন লারা চলে আসতেন বাড়ির উঠোনে। টবগুলোকে ফিল্ডার বানিয়ে ঝাড়ু হাতে ব্যাট করতেন মার্বেলকে বল বানিয়ে। তার চেষ্টা থাকতো 'গ্যাপ' বের করা। এভাবে তার 'হ্যান্ড-আই' সমন্বয় গড়ে উঠেছে। অনেকের হয়তো মনে পড়ে যাবে, ক্রিকেটের কিংবদন্তি স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানও কাজের অবসরে একা একা প্র্যাকটিস করেছেন। পার্থক্য একটিই- লারার বল ছিল মার্বেল, ব্র্যাডম্যানের গলফ্ বল। আর্থিক টানাটানিতে অবশ্য লারার জন্য গলফ্ বল জোগাড় করাটা ছিল অনেক কষ্টের। এভাবে মার্বেলের বিপক্ষে ব্যাট করে লারা তার টবগুলো নিখুঁত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। ঝাড়ু ব্যবহার করতেন বলে অভ্যাসবশে তার 'ব্যাক লিফট' হয়েছে অনেক উঁচু। কারণ, উচ্চতা থেকে দ্রুত নামালে শক্তি অনেক বেশি পাওয়া যায়। বল মারা যায় অনেক জোরে। এটাই ছিল লারার মূল চিন্তা। অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম হলে তিনি হয়তো শিখতেন- পাওয়ার নয়, টেকনিকই আসল। ছেলেবেলায়

কে রি য়া র

	ম্যাচ	ইনিংস	অপঃ	রান	সর্বোচ্চ	গড়	৫০/১০	ক্যাচ	স্ট্রাইক রেট
টেস্ট	১২১	২১৪	৬	১১২০৪	৪০০	৫৩.৮৬	৪৬/৩১	১৪৮	৬০.৫৪
ওয়ানডে	২৫৯	২৫২	২৬	৯৩৫৯	১৬৯*	৭৯.৪৬	৫৭/১৯	১০৯	৭৯.৬৪

এবার মিডউইকেট দিয়ে চার

তো আর ব্যক্তিগত ট্রেনার থাকে না। তাই নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েই স্থানীয় লীগ কাঁপিয়ে ফেলেন লারা। তার স্ট্রোকোর ফুলঝুড়ি আর ধারাবাহিক রানের মধ্যে থাকা নজর কাড়ছিল অনেকের। ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপের পর অধিনায়ক রিচার্ডস যে কজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের নাম বলেছিলেন তার মধ্যে লারা ছিলেন ঊর্ধ্বে। ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাকে টেস্ট স্কোয়াডে নিয়ে আসে ১৯৮৯ সালের এপ্রিলে। সেবার ভারতের বিপক্ষে হোম সিরিজে অবশ্য ড্রিংকস বয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়, পরের বছর পাকিস্তানে খেলার সুযোগ মেলে কাকতালীয়ভাবে। ভারত তাদের প্রস্তাবিত সফর বাতিল করলে পাকিস্তান পড়ে বিপাকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সম্মতি দিলে পাকিস্তান সিরিজ আয়োজন করে। করাচিতে ওয়ানডে অভিষেকে লারা খেলেন মিডল অর্ডারে। যখন পাঁচ নম্বরে ব্যাট করার সুযোগ আসে তখন অপর প্রান্তে ওয়াকার ইউনুস বল হাতে। 'হ্যাটট্রিক' ঠেকাতে মাঠে এসেছেন অভিষেক লারা। নিজের প্রতিভার সুবিচার করতে পারেননি। আউট হয়েছেন ১১ রান করে।

লাহোরের তৃতীয় টেস্টে অভিষেক হয় ত্রিনিদাদের রাজার। ব্যাটসম্যান বেস্টের ইনজুরিতে দলে সুযোগ হয়। সিরিজে ১-১ সমতা। পাকিস্তানের বোলাররা তখন (আকরাম-ওয়াকার-ইমরান-কাদির) যেকোনো ব্যাটসম্যানের জন্য দুর্বিষহ পরীক্ষা। সুযোগ থাকলে যা কেউ নেবেন না। লারার অবশ্য সুযোগ নেই। অভিষেক হচ্ছে। একে তো নার্ভাস, তার ওপর দলের দুই উইকেট চলে গেছে। আকরামের 'নো' বলে ক্যাচ দিয়ে বেঁচে গেলেন। বেঁচে যান ওয়াকারের বলে খোঁচা মেরেও। শুরুতে বেশ অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। শেষ পর্যন্ত হুপারের সঙ্গে জুটি বেঁধে ৯৫ রান তোলেন। কাদিরের বলে আউট হবার আগে ব্যক্তিগত ৪৪ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংস করেছিলেন আরো খারাপ। মাত্রা ৫ রান। টেস্ট অবশ্য ড্র হয়েছিল।

লারা হয়তো ভাবেননি এরপর জায়গা নিয়ে সমস্যা হবে। কিন্তু, পরের টেস্ট খেলতে তাকে অপেক্ষা করতে হয় আরো ১৭ মাস। ঘরোয়া লীগে ভালো করতে থাকলেও জাতীয় দলের তারকাখচিত লাইনআপে তার জায়গা ছিল না। হাতে ভালো স্ট্রোক থাকায় ওয়ানডে দলে তার জায়গা হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বার্বাডোজে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার আগে ২৭টি ওয়ানডে খেলে ফেলেছিলেন লারা। বার্বাডোজের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৪ রানের ইনিংসটি তার জীবন বদলে দেয়। তার কনসেনট্রেশন, ধৈর্য এবং দুর্দান্ত শটগুলো টেস্ট দলে জায়গা করে দিতে সহযোগিতা করে। এমনিতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে তখন লোগি-ভিভ রিচার্ডসন-ফ্রিনিজদের বিকল্প চিন্তা করা হচ্ছিল। ডোনাল্ড-কাইপার-স্নেল-প্রিঙ্গলদের বিপক্ষে খেলা ইনিংসটি নির্বাচকদের আস্থা অর্জনে যথেষ্ট ছিল।

তার আত্মবিশ্বাস, টাইমিং এবং পাওয়ার অতিমানবীয় পর্যায়ে পড়ে। মনে আছে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে খেলা দ্বিতীয় ওয়ানডে? ওপেন করতে নেমে ৪৫ বলে সেঞ্চুরি। ভালো বল, খারাপ বল সব যাচ্ছিল মাঠের বাইরে। অধিনায়ক বুলবুল স্পিনারদের আক্রমণে আনার পর মিড উইকেটকে পাঠালেন ডিপে। লংঅনকে আনলেন মিডঅনে লারা ছক্কা মারলেন মিড অনের ওপর দিয়ে। ভাবখানা এমন- ওঃ তোমরা চাইছো আমি মিড অনের ওপর দিয়ে মারতে গিয়ে আউট হই। দেখ, বল মাঠের বাইরে পাঠালাম। পরের বলে ফিল্ডিং উল্টে দিলেন বুলবুল। মিড উইকেট আনলেন ভেতরে। এবার মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ছয়। শুধু বাংলাদেশ বলে নয়, যেকোনো বোলারকে নিয়ে ছেলেখেলা করার ক্ষমতা আছে লারার। ১৯৯২ সালে ওয়াসিম-আকিব-মুশতাকরা দেখেছিলেন মাঠে, বিশ্বকাপে লারার স্ট্রোকসমৃদ্ধ ইনিংস। আকরামের ইয়র্কারে আহত না হলে সেঞ্চুরি হয়ে যেত।

আক্রমণাত্মক খেলা খেলতে চান বলে খুব দ্রুত রান ওঠে তার। অনায়াস ভঙ্গি, অদ্ভুত অথচ দারুণ সব স্ট্রোক প্লে দর্শকদের মন ভরিয়ে দেয়। ব্যাকরণগত দিক দিয়ে শচীন, মার্ক ওয়াহ, দ্রাবিড় বা ক্যালিসের মতো নন লারা। কিন্তু ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে তার জুড়ি নেই। টেস্ট কি ওয়ানডে, দুটোতেই তিনি অসাধারণ। ব্র্যাডম্যানের মতো ফোকাস থাকলে আরো উঁচুতে উঠতেন তিনি। তার মুড খুব দ্রুত বদলায় বলেই বছরে মাত্র কয়েকবার রেকর্ড হয়। সেঞ্চুরি করেন। মনোসংযোগ ঠিক থাকলে এবং মুড নিয়ন্ত্রণ করলে এতো দিনে তার টেস্ট সেঞ্চুরি ৪৫ ছাড়িয়ে যেত। খুব বেশি মুডি বলে মাঝে মাঝে বিপক্ষের কাজ বা মন্তব্য তার খেলায় প্রভাব ফেলে। ১৯৯৮-৯৯ সালে একবার অসিরা প্র্যাকটিস ঠিকমতো করতে দেয়নি লারাকে। কিং লারা যে পিচে প্র্যাকটিস করতেন সেখানে অসিরা নিজেদের নেট টাঙিয়ে প্র্যাকটিস করছিল। ভাবখানা যেন অনিচ্ছাকৃত ভুল। বিরক্তি এবং রাগের সবটুকু পরদিন শুরু হওয়া টেস্টে দেখিয়েছিলেন লারা। ব্যাট হাতে ২১৩ রান করেছিলেন। পরের সফরে ব্যাপারটা আরো ভয়াবহ হয়। অন্তত অসিদের জন্য। লারা তখন অ্যাওয়ে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে ববি সিম্পসন বলেই বসলেন, 'লারা ভালো ব্যাটসম্যান তবে গ্রেট নন। এমন অধারাবাহিক হলে গ্রেট হওয়া যায় নাকি? লারার বিশ্ব রেকর্ড তো দুর্বল বোলিংয়ের বিপক্ষে।' অ্যাডিলেডে লারা যখন নামেন তখন পন্টিং বলতে থাকেন, 'সেরা ব্যাটসম্যান এমন হয়! রান তুলতে পারে না। এতো ধীরে খেলে।' এসব শোনার পর লারার খেলা হঠাৎ করে বদলে যায়। শুরু হয় স্ট্রোকের ফুলঝুরি। একই ব্যাপার হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। মুরালির ঘূর্ণি এবং লারার হ্যামস্ট্রিং সমস্যা। সেবার দল হারলেও বাঁহাতি ব্যাটসম্যান করেছিলেন ২২১ ও ১৩৫ রান।

লারা যখন খেলেন তখন করার কিছু নেই। বিপক্ষ দলের প্রার্থনা থাকে একটিই। সুযোগ এলে যেন তারা লুফে নিতে পারে। নিলে লারা আউট হবেন। যেমন হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রানআউট। ২৭৭ রানের ইনিংসটি দেখে শেন ওয়ার্ন বলেছিলেন, 'ওই দিন রানআউট না হলে আমার মনে হয় এখনো ব্যাট করে যেতেন লারা।' তবে তাকে আউট করতে না পারলে বিপদ আছে। ১৯৯৪ সালে অ্যান্টিগুয়ায় ইংরেজ বোলারদের কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন তিনি। ৩৭৫ রানের ইনিংসটি খেলে ভেঙে দিলেন সোবার্সের ৩৪ বছর স্থায়ী রেকর্ডটি। ম্যাথু হেইডেন দুর্বল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে লারার রেকর্ড ভেঙেছিলেন। মুখে কিছু না বললেও ছয় মাস পর লারা আবারও ইংল্যান্ডকে সামনে পান। সেই অ্যান্টিগুয়ায়।

ফলাফল ইংরেজদের জন্য ভয়াবহ। লারা করলেন ৪০০ রান। ব্র্যাডমানের পরে তিনিই একমাত্র ব্যাটসম্যান, যিনি টেস্টে দুবার ৩০০-র ওপরে রান করলেন। লারাকে আউট না করতে পারলে এমনই হয়। রানের পাহাড়। শুধু টেস্ট নয়, প্রথম শ্রেণীর ম্যাচেও ইংরেজ বোলাররা মজা বুঝেছেন। কাউন্টি খেলতে মাঝারি দল ওয়ারউইকশায়ারের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন ৪০ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে। ১৯৯৪ সালের বিধ্বংসী ফর্মে কাউন্টির ৮ ইনিংসে ৭ সেঞ্চুরি করেন। ৫০১ রান করে ভাঙেন হানিফ মোহাম্মদের ৪৯৯ রানের রেকর্ড। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে টানা ৭ ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন তিনজন- ফ্রাই, ব্র্যাডম্যান ও প্রক্টর। ষষ্ঠ ইনিংসে ২৬ রানে আউট না হলে লারা ৮ ইনিংসে টানা সেঞ্চুরি করার অনন্য রেকর্ড গড়তেন। কিন্তু রেকর্ড গড়ার চেয়ে স্ট্রোক খেলা তাঁর পছন্দ। তাই মাঝে মাঝে খুবই আক্রমণাত্মক হয়ে নিজের ইনিংস শেষ করে দেন অচিরেই। বিপক্ষের কথায় তেঁতে উঠে নিজে এবং দলকে বহুবার বিপদেও ফেলেছেন তিনি। ১৯৯৯-এর বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার আগে ম্যাকগ্রা বরাবরের মতো 'লারাকে আউট করবো' জাতীয় কথা বলে আসছিলেন। খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের মড়কের সময় লারা নামলেন। চতুর স্টিভ ম্যাকগ্রাকে রাখলেন আক্রমণে। ম্যাকগ্রা-লারার বাদানুবাদ হলো। তারপর? ম্যাকগ্রার স্লোয়ারে বোল্ড হয়ে গেলেন লারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ হারালো।

তারপরও লারার দলের ভার বহন ক্ষমতা অসাধারণ। ব্র্যাডম্যান (২৩%) ও হেডলিই (২১%) তার চেয়ে এগিয়ে। দলের মোট রানের ক্ষেত্রে লালার ভূমিকা ২০%, যেখানে রিচার্ডস (১৫%), সোবার্স (১৬%), টেন্ডুলকার (১৭%) ও ইনজামাম (১৮%) অবদান রেখেছেন। ব্যাটসম্যান আর বোলার দু'ক্ষেত্রে চিন্তা করলে স্যার হেডলিই একমাত্র আসবেন যিনি লারার চেয়ে বেশি চাপ সহ্য করেছেন। তবে চাপ সহ্য-অসহ্যের মধ্যেও লারা তার খেলার স্টাইল বদলাননি। এই আগ্রাসী ব্যাটিংয়েই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০০৩ সালে রবার্ট পিটারসনের বিপক্ষে এক ওভারে ২৮ (৪, ৬, ৬, ৪, ৪, ৪) রান নেন। লারা ডবল সেঞ্চুরি করলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রোটিয়াসদের কাছে ১৮৯ রানে হেরে যায়।

অধিনায়ক এবং মূল তারকার চাপ সহ্য করা সম্ভব হয় না বলেই ক্রিকেট থেকে সাময়িকভাবে নিজে সরে যান। 'ক্রিকেট খেলায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।'- এই ছিল তার উক্তি। বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আবার ফিরে আসেন। তখন দেখা যায়, লারা আগের মতো আক্রমণাত্মক থাকলেও মাঠের বাইরের বিষয়েই তার মনোযোগ বেশি। নাইট ক্লাবে ঘোরা, বান্ধবীদের সময় দেয়া আর প্র্যাকটিসে কম সময় দেয়া ছিল নিয়মিত ব্যাপার। ওয়ালশ, হুপার দুজন যখন অধিনায়ক ছিলেন তখন লারা-বিষয়ক প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন বিরক্তিতে। লারা কী করবেন, কেমন খেলবেন এসব ব্যাপার তারা এড়িয়ে যেতেন। লারার খেলায় মন নেই, পয়সার জন্যই তার খেলা, লারা শেষ। এমন গুঞ্জন ছিল অনেক জায়গায়। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ২০৩ বলে করা ১৯১ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংসটি লারার ফিরে আসার ইঙ্গিত ছিল। দুর্বল দলের বিপক্ষে সেঞ্চুরি- পাত্তা দেননি বিশেষজ্ঞরা। মিডিয়াও খুব আমল দেয়নি। লারা পরিণত হচ্ছেন এটা কেউ বুঝতে পারেননি। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে তাই। এবার ওয়ার্ল্ড সিরিজে ভালো করতে পারেননি। বিশ্ব একাদশে থাকায় বেশ ভালো টাকা পেয়েছেন। এই নিয়ে মিডিয়ায় কটাক্ষ করা হয়েছিল। যদিও তার যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। পারফরমেন্স ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। ওয়ানডে ম্যাচেও ভালো করেননি। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে শুরুর টেস্টেও নয়। লারার পরিবর্তন এলো তার পয়মন্ত অ্যাডিলেডে। প্রথম কয়েকটি বল খেললেন অস্বস্তিতে। তারপর দেখা গেল নতুন লারাকে। ম্যাকগ্রার বল শাফল করে খেললেন। তার সাবধানতা যেন বলে দিচ্ছিল 'এবারে উইকেটের সব বল সাবধানে খেলব।' ম্যাকগ্রা, লি, ওয়ার্ন সবাইকে খেলেছেন সাবধানতার সঙ্গে। তাই বলে রক্ষণাত্মক হননি, বাজে বলগুলো সীমানার বাইরে পাঠিয়েছেন। তার শট সিলেকশন ছিল নির্ভুল। আগের সেই খামখেয়ালি লারাকে দেখা যায়নি। উঁচু ব্যাকলিফটও কমিয়েছেন কয়েক সেন্টিমিটার। আয়েশী খেলার ভাবের সঙ্গে ছিল দলকে সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কারণ চন্দরপলের অধিনায়কত্ব লারার ওপরে কিছুটা হলেও মানসিক চাপ কমিয়েছে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই ইনিংসে।

লারা নিজে বলছেন, তার সেরা ইনিংস হলো অ্যাডিলেডে করা অষ্টম ডবল সেঞ্চুরি। একমাত্র ব্র্যাডম্যান করেছেন তার চেয়ে বেশি, ১২টি। তবে অবস্থা, প্রেক্ষাপট বিচার করলে তার শ্রেষ্ঠ সেঞ্চুরি ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে বার্বাডোজে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে করা অপরাজিত ১৫৩ রান। সে দিন ৩০৮ রানের জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ১০৫ রানে। স্টিভ ওয়াহর অসিরা চেপে বসেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওপর। বাজে বলগুলোও কেউ খেলছিলেন না। লারাও ছিলেন চাপে। মিডিয়া তার ক্যাপ্টেনসি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। ক্যাপ্টেনসি যায় যায়। সিরিজে ২১৩ ও ১০০ রান তার দলে অপরিহার্যতা প্রমাণ করেছিল। কিন্তু ম্যাকগ্রা-ওয়ার্ন-গিলেস্পিরা যেভাবে চেপে ধরেছিল ,সিরিজ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। টেল এন্ডারদের সঙ্গে ব্যাট করতে হচ্ছে। তাদের একদিকে কম বল খেলতে দেয়া, অন্যদিকে স্কোরবোর্ড সচল রাখা, দুটোই করে যাচ্ছিলেন। অন্য ব্যাটসম্যানরা চেষ্টা করতেন ড্র করতে। এমনকি ড্রও 'অসাধারণ' ফলাফল হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু ক্রিজে তো ব্রায়ান লারা। সাধারণ মানুষ যা করবে তাতে তিনি সীমাবদ্ধ নন। খেলতে শুরু করলেন ম্যাচ জেতার জন্য। নিজে স্ট্রোক খেলছেন। শেষ বলে রান ‖b‡"Qb 'স্ট্রাইক' ধরে রাখতে। টেল এন্ডারসদের পরামর্শ দিচ্ছেন ম্যাকগ্রা ও ওয়ার্নের বল খেলার ব্যাপারে। প্রথমে অ্যামব্রোস আর পরে ওয়ালশকে সঙ্গে নিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুললেন দলপতি লারা। ম্যাচ শেষে তার ব্যক্তিগত ১৫৩ রানে সিরিজে ২-২ সমতা থাকল। লারা বলেই এটা সম্ভব হলো।

লারা নিজে বলছেন, তার নতুন লক্ষ্য ব্র্যাডম্যানের ১২টি ডবল সেঞ্চুরির রেকর্ড। তবে ২০০৭-এর বিশ্বকাপ শিরোপা নিশ্চয়ই গুরুত্ব পাবে তার কাছে। বিশ্বকাপ জয় এক দিনের ম্যাচের কর্তৃত্ব দলকে এনে দেয়। বিশ্বকাপ জয় লারার শ্রেষ্ঠত্বের পাতায় হবে আরো একটি। শিরোপা না জিতলে জায়গাটি ফাঁকা থেকে যাবে। পরিপূর্ণতা পাবে না ক্যারিবীয় গ্রেটের ক্রিকেট অধ্যায়। পূর্ণতা পাক কি না পাক, বর্তমান ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় সেলিব্রেটি লারা। তিনি বছর ২/৩ পরে যখন অবসর নেবেন তখন তারকা দ্যুতি কমে যাবে ক্যারিবীয় দলে। ক্রিকেটাঙ্গনে।

ভবিষ্যৎ রেকর্ড

- **সেঞ্চুরি :** গাভাস্কার (৩৪টি), টেন্ডুলকার (৩৫টি), স্টিভ ওয়াহ (৩২টি) টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন। লারা করেছেন ৩১টি, বর্তমান ফর্মে থাকলে ৩৬-৩৮টি সেঞ্চুরি করতে পারেন লারা। ক্যারিয়ারে ৪৫টি সেঞ্চুরি করতে পারবেন আরো সংযত হলে।
- **ডবল সেঞ্চুরি :** ব্র্যাডম্যানের ১২টি। লারার ৮টি। ধরে ফেলা সম্ভব হতে পারে। ভাঙা হবে খুব কঠিন।
- **ছক্কা :** টেস্টে কিউই অলরাউন্ডার কেয়ার্নস মেরেছেন ৮৭টি ছয়। গিলক্রিস্টের সংখ্যা ৮৫টি। রিচার্ডস ৮৪টি। লারা মেরেছেন ৭৮টি। গিলক্রিস্ট না লারা। এটাই প্রশ্ন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হবার সম্ভাবনা বেশি লারার।
- **ক্যাচ :** ভালো ফিল্ডার না হলেও ক্যাচ ধরেছেন ১৪৮টি। বেশির ভাগ স্লিপ, কাভার বা মিড উইকেটে। মার্ক ওয়াহর ১৮১টি টপকাতে পারবেন না। তবে মার্ক টেলর (১৫৭) বা বোর্ডারকে (১৫৬) টপকে যেতে পারবেন।